Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুদ্রারাক্ষস ও প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.2
Pages	29-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

মুদ্রারাক্ষস ও প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি

পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রথাগত প্রেমাশ্রয়ী বিষয় পরিহার করে রাজনৈতিক বিষয়-নির্ভর নাটক *মুদ্রারাক্ষস* সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। এ-নাটকটি *অর্থশাস্ত্র* অনুসরণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত বলে সমালোচকেরা মনে করেন। নাট্যকার বিশাখদত্ত *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে *অর্থশাস্ত্রের* বিধিবিধান কিভাবে রূপ দিয়েছেন, সেটি দেখার প্রয়াসেই বর্তমান প্রবন্ধ।

মুদ্রারাক্ষস-এর ঘটনাবলি, চরিত্র এবং সংলাপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত রীতিনীতি অনুসরণ করেই বিশাখদত্ত নাটকটি রচনা করেছেন। এমন কি *অর্থশাস্ত্রের* বহু পারিভাষিক শব্দও *মুদ্রারাক্ষসে* ব্যবহার করা হয়েছে। এসব বিবেচনায় *মুদ্রারাক্ষসকে* প্রাচীন ভারতের রাজনীতি-নির্ভর নাটকের সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে *মুদ্রারাক্ষস* একটি মূল্যবান সংযোজন। নাট্যকার বিশাখদত্ত প্রথাগত প্রেমাশ্রয়ী বিষয় পরিহার করে কুটিল রাজনীতি অবলম্বনে *মুদ্রারাক্ষস* নাটকটি প্রণয়ন করেছেন। এই নাটকটিতে নায়িকা চরিত্র নেই। প্রস্তাবনায় নটী এবং শেষ অঙ্কে চন্দন দাসের স্ত্রীর স্বল্পকালীন উপস্থিতি ছাড়া এই নাটকে অন্য কোনো রমণী চরিত্র দেখা যায় না। নন্দরাজদের হত্যা করার পর চাণক্য তাঁদের সিংহাসনে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপন করেন। অপরদিকে নন্দরাজদের পরম বিশ্বাসী ও হিতৈষী মন্ত্রী রাক্ষস প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। মৌর্যসচিব চাণক্য এবং নন্দসচিব রাক্ষস এই দুই ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের কূটকৌশল প্রয়োগের নাটকীয় রূপায়ণ মুদ্রারাক্ষস। চাণক্য দাম্ভিক, আত্মশক্তিতে আস্থাবান, কূটনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; অপরদিকে রাক্ষস সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, যুদ্ধকর্মে পারঙ্গম, ভক্তিমান, স্নেহপ্রবণ, দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী ও বন্ধুবৎসল। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যে গুণাবলীর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য যা-ই থাক না কেন উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন নয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থিতি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করানো চাণক্য অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। অপরদিকে রাক্ষসের প্রয়াস হচ্ছে নন্দসিংহাসন দখলকারী চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করে নন্দবংশেরই কোনো ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করা। এই দুই ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে জটিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবতারণা, কুটিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের জাল বিস্তার, গুপ্তচরদের কর্মতৎপরতা, প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ, একান্ত অনীহা সত্ত্বেও বন্ধুপ্রীতিতে মুগ্ধ রাক্ষসের আত্মসমর্পণ — এসব ঘটনাই নাট্যরূপ লাভ করেছে মুদ্রারাক্ষস নাটকে।

সংস্কৃত নাট্য সমালোচকদের মতদ্বৈততার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অধিকাংশের মতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে *মুদ্রারাক্ষস* নাটক রচিত হয় [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ২৫৮]। এই নাটকটির পরিচয় জ্ঞাপনার্থে সমালোচকগণ যে অভিন্ন অভিধায় এর পরিচয় দিয়েছেন সেটি হলো *মুদ্রারাক্ষস* একটি 'রাজনীতিমূলক নাটক'। এখন প্রশ্ন হলো, নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করতে গিয়ে যে রাজনৈতিক কূটকৌশলের প্রয়োগ দেখিয়েছেন সেগুলো কি তার নিজ উদ্ভাবিত অথবা কোনো রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থের রূপরেখায় নাটকটি রচিত ? এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্র নাথ দের মন্তব্য স্মরণ করা যায় ঃ

> অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশাখাদত্ত অর্থশাস্ত্রের বিধি-নিষেধই শুধু নয়, বহু পরিভাষাও হুবহু তাঁর নাটকে *(মুদ্রারাক্ষসে)* নিয়ে এসেছেন [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ২৫৮]।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বিদগ্ধ সমালোচকগণের মতে *মুদ্রারাক্ষস* একটি রাজনীতিমূলক নাটক এবং এটি *অর্থশাস্ত্র* অনুসরণে রচিত। *অর্থশাস্ত্রের* বিধি-বিধান নাট্যকার কিভাবে *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে রূপ দিয়েছেন সেটি দেখার প্রয়াসেই বর্তমান প্রবন্ধ। তবে নাটকটি পর্যালোচনার পূর্বে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝাত এবং তার স্বরূপ কি ছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জেনে নেওয়া যাক।

দুই

আধুনিককালে যা রাষ্ট্রনীতি সেটিরই প্রাচীন ভারতীয় নাম অর্থনীতি। আর অর্থনীতি যে গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তারই নাম অর্থশাস্ত্র। এই অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কৌটিল্য বলেছেন :

> মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।
> তস্যাঃ পৃথিব্যা লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি।
> [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১৫৯]

অর্থাৎ মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা হয়। আবার মানুষযুক্ত ভূমির নামও অর্থ। যে শাস্ত্রে সেই পৃথিবীর (ভূমির) লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে তার নাম অর্থশাস্ত্র।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থশাস্ত্র শব্দটি শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থকেই চিহ্নিত করছে না, বরং এটি রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলির একটি সাধারণ নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থশাস্ত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে U. N. GHOSHAL বলেন :

> *Arthasastra,* according to the view of its authoritative exponent signifies the science (or arts) of government in the widest sence of the term. [U. N. Ghoshal ১৯৬৬ : ৮১]।

এই অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব কখন কিভাবে ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে এর বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ যে অবদান রেখে গেছেন তা অবশ্যই স্বীকার্য। *ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ* প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যকর্মে তথা ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতাদের চিন্তা-চেতনায় রাজধর্মের বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। [U. N. Ghoshal ১৯৬৬ : ৪-৭]।

অনুরূপভাবে জনপ্রিয় *রামায়ণ* ও *মহাভারত* -দু'টি জাতীয় মহাকাব্যের মধ্যেও এ সম্পর্কিত কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

রামায়ণের দিকে দৃষ্টি দিলে তৎকালীন সমাজ জীবনে আদর্শ নৃপতির কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়টির ধারণা জন্মে। পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে রাম বনবাসে চলে গেলে ভরত তাঁকে ফিরিয়ে আনার আবেদন নিয়ে রামের নিকট গমন করেন। চিত্রকূট পর্বতে রামের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ। সেখানে রাম অযোধ্যারাজের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে ভরতকে অনেক প্রশ্ন করেন ঃ ভরত ধনুর্বেদ বিশারদত্ত অর্থশাস্ত্রবিদ সুধন্বার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন কি না? তিনি শূর, বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশসম্ভূত ইঙ্গিত পুরুষগণকে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কি না? সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ করে একজন বিদ্বানকে সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কিনা? অযোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে, যোগ্যলোকদের অযোগ্য স্থানে নিয়োজিত করেন নি তো ভরত? রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভরত কি নির্লোভ অমাত্য, পিতৃ-পিতামহাদি পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করে আসছেন ও যাঁদের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় বিশুদ্ধ সেই সকল শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে শ্রেষ্ঠ কর্মে নিযুক্ত করেছেন? যুদ্ধে পারঙ্গম, বিপদে ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, সদ্‌কুলসম্ভূত শ্রদ্ধাচারী ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন কি না? রাজ্যের আভ্যন্তর শাসন এবং অন্য রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে যথাযথ চর নিযুক্তির মাধ্যমে ভরত উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন কি না?

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সমৃদ্ধির জন্য ভরত উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন কি? রাজ্যের দুর্গসমূহ, ধন-ধান্য, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রশিল্পী ও যোদ্ধৃগণের দ্বারা পরিপূর্ণ আছে কি না? নিরপরাধ সজ্জন ব্যক্তিদের দণ্ড এবং অপরাধীদের ধনলোভে ছেড়ে দেওয়া হয় না তো? সন্ধি, বিগ্রহ, যান প্রভৃতি ষাড়গুণ্য সম্পূর্ণ অবগত হয়ে ভরত তা যথাযথ প্রয়োগ করছেন কি না? তিনি প্রজাগণকে রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অত্যাচার থেকে, তস্করদের আক্রমণ থেকে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে, রাজবল্লভ ও রাজার নির্যাতন থেকে রক্ষা করছেন কি না? [অমরেশ্বর ঠাকুর ১৯৩০ : ১৮২৪-১৮৫০]।

শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নাবলীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে কল্যাণরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সুদক্ষ মন্ত্রিপরিষদ, যুদ্ধকর্মে পারঙ্গম প্রভুভক্ত সেনাপতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র তথ্যাহরণকারী চরগণ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল তা অবগত হওয়া যায়। এ ছাড়া প্রজাদের মঙ্গল বিধানের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশয় ও দ্বৈধীভাব- ষাড়গুণ্য অবলম্বনে রাজ্য পরিচালনা করা ছিল রাজার আবশ্যিক কর্তব্য।

অনুরূপভাবে *মহাভারতেও* তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে *অর্থশাস্ত্রের* উদ্ভব ও বিকাশের পরিচয় মেলে। *মহাভারতের* শান্তিপর্বে এ সম্পর্কে যুধিষ্ঠির মহামতি বীর যোদ্ধা ভীষ্মদেবের নিকট থেকে প্রশ্ন করে করে রাজার কর্তব্যাকর্তব্যসহ জীবনের বহু সমস্যা সমাধানের উপায় জেনে নিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ভীষ্মদেব বলেন, সত্যযুগে

প্রথমে পৃথিবীতে রাজা, রাজ্য, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মানুষ মাত্রই ছিল ধর্মপরায়ণ এবং একে অপরকে সহযোগিতা ও সাহায্যের মাধ্যমে সুন্দর জীবন যাপনই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এইরূপে কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর মোহ মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করে; ফলে মানুষ ক্রমে লোভী ও পরধনে আগ্রহী, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্যাকার্য বিবেকশূন্য হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে নরলোকে ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ বিলুপ্ত হওয়ার পথে উপনীত হয়। মনুষ্যলোকের এই দুরবস্থা দেখে দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে মানবদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে তাদের সুশৃঙ্খল ধর্মীয় ও নীতিনির্ভর সুন্দর জীবনযাপনের উপায় বিধানের অনুরোধ জানান। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা বুদ্ধিবলে লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একখানি নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের মাধ্যমে জগতের যাবতীয় লোক দন্ড প্রভাবে পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হওয়ার কথা। তাই এ শাস্ত্রের নাম হয় 'দণ্ডনীতি'। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এতে সবিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

ব্রহ্মার রচিত নীতিশাস্ত্র বা দণ্ডনীতি ভবানীপতি বিশালাক্ষ শিব প্রথমে গ্রহণ করলেন এবং মানুষের স্বল্পায়ুর কথা চিন্তা করে তিনি ঐ লক্ষ অধ্যায়ের নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করে দশ সহস্র অধ্যায়ে পর্যবসিত করলেন। এই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্রের নাম হলো 'বৈশালাক্ষ নীতিশাস্ত্র'। এরপর ভগবান ইন্দ্র ঐ শাস্ত্র পাঁচ হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করে 'বাহুদন্তিক নীতিশাস্ত্র' নাম প্রদান করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ঐ গ্রন্থকে আরো সংক্ষিপ্ত করে তিন সহস্র অধ্যায়ে নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হয় 'বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র'। এই সংক্ষিপ্ত করার প্রক্রিয়াটি আরো এগিয়ে চলে; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সহস্র অধ্যায়ে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। [কালিপ্রসন্ন সিংহ ১৯৯৩ : ৪১১-১৩]।

নীতিশাস্ত্র সৃষ্টি হওয়ার পর দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চান, মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি শাসকের ভার গ্রহণ করবেন? ভগবান বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ 'বিরজা' নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু 'বিরজা' পৃথিবীর অধিপতি অর্থাৎ রাজা হতে অনিচ্ছুক হন। এই বিরজার বংশধারায় পঞ্চম পুরুষ বেন জন্ম গ্রহণ করে খুব অত্যাচারী, ধর্মবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁর প্রাণ সংহার করেন এবং ঐ বেনের দক্ষিণ হস্ত থেকে এক পরম শক্তিধর, জ্ঞানবান, যুদ্ধবিশারদ, দণ্ডনীতিতে কুশল এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। দেবতা এবং ঋষিগণ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং লোকরক্ষার জন্য নির্দেশ দেন। এই কাজে সহায়তা করার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই ঘটনা থেকে মানুষ রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে আসছে। *মহাভারত*

—৩

বর্ণিত এই কাহিনীর মধ্যে রাজার দৈবোদ্ভব প্রত্যক্ষ করা যায় [P. V. Kane ১৯৪৬ : ৩৩] ।

দেশের শাসককে রাজা নামে অভিহিত করা হতো। তবে প্রশ্ন ওঠেছে রাজার গুণাবলী সম্পর্কে। রাজার মধ্যে কি এমন বিশিষ্ট গুণ থাকবে যার জন্য সমাজের অন্য সকল লোক তাঁকে শ্রদ্ধা ও শাসক হিসেবে মান্য করবে? উত্তরে *মহাভারতে* বলা হয়েছে, সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে সমশক্তি, সমবুদ্ধির অধিকারী হওয়ার কথা। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে একই শ্রেণির সৃষ্ট জীবের মধ্যে আকৃতিতে প্রকৃতিতে, জ্ঞানে-গরিমায়, শক্তি-সাহসে, মনে-মেজাজে সকলে সমান নয়; তাই মানুষের মধ্যে যিনি অশঙ্কিত চিত্তে নিয়ত ধর্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ করে সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদ অদূরে পরিহার, কেউ ধর্মপথভ্রষ্ট হলে ধর্মানুসারে তার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে দেশ ও দশের কল্যাণে সম্যক ধর্মপালনের চেষ্টা এবং স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ প্রভৃতি অনুশীলনে যিনি দক্ষ তিনি হবেন রাজা [কালিপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৩ : ৪১৪]।

যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ভীষ্মদেব রাজার প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষা, ধর্মাচরণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ বাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণের ধর্মাচরণ, জীবিকা নির্বাহ, ঐশ্বর্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষরক্ষা, কোষ উৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, যাড়গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু-অসাধু, প্রধান-নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদের রক্ষণ, অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষ উৎপাদন, দুর্বলদের আশ্রয় দান এবং জয়লাভ বিষয়ক কৌশলের কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির আত্মপক্ষীয় বীরদের প্রতি ব্যবহার, তাদের উৎসাহ বর্ধন, ভেদবুদ্ধিশূন্যত এবং শত্রু বিজয় ও সুহৃদ্‌লাভের উপায় সম্বন্ধে জেনে নেন।

এ ছাড়া রাজকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্মদেব বলেন, সকলকে প্রাপ্যাংশ প্রদান করে ভোজন, অমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলমদে মত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করা রাজার প্রধান কর্তব্য। রাজা কায়মনোবাক্যে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকবেন। অপরাধ করলে স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না। এবং দস্যুদল দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত দুর্বলদের পোষণ ও প্রজা প্রতিপালন করবেন। রাজা হবেন প্রজ্ঞাবান, বলপরাক্রান্ত এবং দণ্ডনীতির বিলক্ষণ অনুশীলনকারী।

এ ছাড়া সৎকুলোদ্ভব, একান্তানুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধ অমাত্যগণসহ আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য পরীক্ষা করবেন রাজা। শাস্ত্র মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই উৎকৃষ্ট। ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। কিন্তু রাজা রাজ্যের কল্যাণের

নিমিত্ত সকল সময় ধর্মাচরণ করতে পারেন না। ফলে রাজা যুদ্ধকালে বা রাজ্যকে নিষ্কন্টক করার জন্য অনেক নিষ্ঠুর কার্য করে পাপভাগী হয়ে থাকেন। তবে এহেন পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রজা রক্ষণদ্বারাই রাজার পাপ বিনষ্ট হয়।

শত্রুর প্রতি আচরণে রাজার কি করণীয় সে বিষয়েও ভীষ্মদেব উপদেশ দিয়েছেন। শত্রুর প্রতি কখনো অমনোযোগী হতে নেই। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেই শত্রুকে আঘাত করতে হয়। কার্য সাধনের সুযোগ একবার চলে গেলে তা সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। বিজয়াকাঙ্খী রাজাকে শত্রুর প্রতি সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে হয় [কালিপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৩ : ৪৫৬-৭০]।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেব রাজধর্ম সম্পর্কে যে উপদেশাবলী প্রদান করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' শীর্ষক কবিতার মধ্যে। ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র কথা তুললে দুর্যোধন বলেন :

> লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ।
>
> ....
>
> রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই
> শুধু জয়ধর্ম আছে।
> [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭২ : ৩৭৭]

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে রাজার কর্তব্য হবে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাকুলের জীবনও সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন করা।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, রাজা সমাজের কোন বর্ণের লোক হবেন। এ প্রশ্নে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মধ্যে কিছু মতভেদ লক্ষ করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, *"রাজা রাজসূয়েন জেত"*; রাজসূয় যজ্ঞ করা রাজার কর্তব্য। এই যজ্ঞকারী রাজা কি ক্ষত্রিয় হবেন? না কি ব্রাহ্মণ হবেন? এখানে সমস্যা হচ্ছে রাজন্ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের ব্যক্তিকে বোঝান যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে শবর স্বামীর মত হচ্ছে 'রাজন্' শব্দটি ক্ষত্রিয় জাতির বেলায় প্রযোজ্য; রাজ্য শাসন করুন বা নাই করুন। অপরদিকে তন্ত্রবার্তিককার কুমারিলের মতে চতুর্বর্ণের যে কোনো ব্যক্তি যিনি রাজ্য শাসন করেন তিনিই হবেন রাজা। ধর্মশাস্ত্র, পূর্ব মীমাংসা মতে যিনি দেশকে শাসন ও রক্ষা করেন তাঁকে রাজা বলা যেতে পারে। কুল্লুকের মতে যে কোন ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে দেশ ও রাজধানীকে রক্ষা করতে পারেন তিনিই রাজা। রাজনীতিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে

তিনিই হবেন রাজা যিনি প্রজা রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন [P. V, Kane ১৯৪৬ : ৩৮]।

এ প্রসঙ্গে *ভাগবতের* উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য :

রঞ্জয়িস্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ।
অথামুমাহ রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ।। [৪/১৬/১৫]

অর্থাৎ (যিনি) সৎ কর্মদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করবেন, তাঁকে প্রজারা রাজা বলবেন [পঞ্চানন তর্করত্ন ১৩১৯:১৭৬]।

উদ্ধৃতাংশে দেখা যায়, যিনি প্রজাবর্গের রক্ষণ ও সুখ-সমৃদ্ধি সংবর্ধনে সমর্থ তিনিই হবেন রাজা। এখানে কোনো নির্দিষ্ট বর্ণের উল্লেখ করা হয়নি।

'রাজন্' শব্দটি ক্ষত্রিয় শাসকের পক্ষে বেশি প্রযোজ্য হলেও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রদেরও রাজা হওয়ার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। আবার বাংলাদেশে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল একজন শূদ্রজাতীয় লোক ছিলেন বলে অনেকের অভিমত [P. V. Kane ১৯৪৬ : ৩৯]।

রাজ্যের শাসক যে বর্ণের ব্যক্তিই হোন না কেন, তাঁকে যে রাজনীতি বিষয়ক রীতিনীতি অনুকরণ করতে হতো এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় যে সকল গ্রন্থ, গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ সম্ভব হয়েছে তাদের অধিকাংশই আজ দুর্লভ। বর্তমানে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের নিদর্শন হিসেবে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রকেই* বিশেষভাবে বোঝান হচ্ছে। কিন্তু কৌটিল্য তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বিস্মৃত হন নি। গ্রন্থ শুরুতেই তিনি শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতি আচার্যকে প্রণাম জানিয়েছেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১]। এছাড়া ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন (নারদ), কৌণপদন্ত (ভীষ্ম), বাতব্যাধি (উদ্ধব), বাহুদন্তিপুত্র (ইন্দ্র), পরাশর, পারাশর প্রমুখ পূর্বাচার্যের মতামত ও সিদ্ধান্ত কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ফলে কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্র* হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিসমূহের একটি সার সংকলন। তবে কৌটিল্যের অনুসরণে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কামন্দক আচার্য *কামন্দকীয় নীতিসার* নামক অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন।

তিন

সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের সনাতনী প্রারম্ভিকা অনুসরণ করেই নান্দীপাঠের মধ্য দিয়ে মুদ্রারাক্ষস নাটকটির সূচনা হয়েছে। নান্দীশ্লোকে যেমন দেবতা, রাজা বা ব্রাহ্মণের

স্তব-স্তুতি হয়ে থাকে তেমনি নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়েরও ইঙ্গিত এতে লক্ষ করা যায়। এখানে নান্দীর প্রথম শ্লোকে পার্বতীর প্রশ্নোত্তরে শিব তাঁর ললাটের চন্দ্রকলার কথা বলে মস্তকস্থিতা গঙ্গাকে প্রচ্ছন্ন করার যে চাতুরি গ্রহণ করেছেন এটির মধ্য দিয়ে নাটকটির ছলনাময়তার দ্যোতনা লক্ষণীয়। আবার নান্দীর অপর শ্লোকে দেখা যায় পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছায় শিবের সুমিত হস্তপদ সঞ্চালন এবং অনলবর্ষী দৃষ্টি সংহত করার কষ্টসাধ্য প্রয়াসে "সকলের মঙ্গল হোক" এই প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্লোকটির মাধ্যমে শিবের সুসংহত নৃত্য ও দৃষ্টিপাতের কথায় নাটকে উপস্থাপিত রাক্ষস বিজয়ে ইচ্ছুক কূটনীতিজ্ঞ প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্যের কষ্টসাধ্য ও কল্যাণকর কর্ম প্রচেষ্টাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। চাণক্য মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের কল্যাণ কামনায় বিনা রক্তপাতে কৌশলে রাক্ষসকে জয় করার সুকঠিন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। চাণক্যের এই মনোভাব তার গুপ্তচর ভাগুরায়ণের উক্তিতে প্রকাশিত :

রক্ষণীয়া রাক্ষসস্য প্রাণাঃ ইত্যাচার্যোপদেশঃ।
[গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৪৩১]

নান্দী শ্লোকসমূহের পরে সূত্রধার তাঁর স্ত্রী নটীকে 'গুণবতী' 'উপায়নিলয়ে', 'ত্রিবর্গসাধিকে', 'নীতিবিদ্যে' এবং 'কার্যাচার্যে' বলে সম্বোধন করেছেন। এই গুণসমূহ *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত ষড়্গুণকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ষড়্গুণগুলো হলো-সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশয় ও দ্বৈধীভাব। 'মন্ত্রবননীতিবিদ্যে' এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে সূত্রধার নাটকের প্রতিপাদ্য রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি প্রয়োগের সূচনা করেছেন।

মুদ্রারাক্ষস নাটকটির ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একদিকে নন্দ অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে গুপ্তচর ও ঘাতক নিয়োগ করেছেন, অপরদিকে চাণক্য রাক্ষস উদ্ভাবিত কলাকৌশল সব বিনষ্ট করে নিজ সূক্ষ্মনীতির প্রয়োগে রাক্ষসকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছেন। এ থেকে রাক্ষস ও চাণক্যকে অর্থাৎ দুই সচিবকে নাটকটির ঘটনা বিকাশের চালিকাশক্তি রূপে আখ্যায়িত করা যায়। উভয় সচিবই বুদ্ধির কৌশল দেখাতে যত্নবান। চাণক্য তাঁর বুদ্ধিকে শত সেনাশক্তি অপেক্ষাও বলবান বলে মনে করেন এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য কামনা করে বলেন :

একা কেবলমেব সাধনবিধৌ সেনাশতেভ্যোধিকা।
নন্দোন্মুলন দৃষ্ট বীর্য মহিমা বুদ্ধিস্তু মা গান্মম।
[গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৯৫]

অর্থাৎ "আমার এই একমাত্র বুদ্ধি যা কাজ হাসিলের বেলায় শত শত সেনার শক্তিকেও হার মানায়, নন্দবংশ ধ্বংসের সময় যার প্রতাপের পরাকাষ্ঠা লোকে দেখেছে, সেই যেন শুধু ত্যাগ না করে।

চাণক্যের এই উক্তির মধ্যে *অর্থশাস্ত্রোক্ত* 'আন্বীক্ষিকী' বিদ্যার দ্যোতনা সুস্পষ্ট। *অর্থশাস্ত্রের* ভাষায় "এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (অপর) সব বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সর্বকর্মের উপায় বা সাধনস্বরূপ এবং সর্ব প্রকার [বৈদিক ও লৌকিক] ধর্মের আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া সর্বদাই বিবেচিত হয় [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৮]।

প্রস্তাবনার পর চাণক্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে চন্দ্রগুপ্তের শত্রু হিসেবে রাক্ষসের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তবে রাক্ষসের মধ্যে যে মহৎ গুণাবলী রয়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তিনি রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব পদে বরণ করতে চাচ্ছেন। রাক্ষসের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে চাণক্য বলেন :

> "উত্তম! অমাত্য রাক্ষস উত্তম! বৃহস্পতি তুল্য হে মন্ত্রিবর উত্তম! কেননা-
> প্রভুভক্তি থাকলেও বুদ্ধিহীন কাপুরুষ ভৃত্য দিয়ে কী লাভ ? জ্ঞান বিক্রম থাকলেও যার ভক্তি নেই সেই ভৃত্য থাকারই বা কী ফল ? জ্ঞান, বিক্রম ও ভক্তি এক সঙ্গে এই তিনগুণ যাদের আছে তেমন ভৃত্যেরাই রাজার সমৃদ্ধির কারণ হয়; অন্যেরা সম্পদেই হোক, বিপদেই হোক। ভার্যাবৎ [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ২৯৫]।

চাণক্যের এই উক্তির মধ্যে কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত আচার্য বাহুদন্তিপুত্র ইন্দ্রের অমাত্য সম্বন্ধে বিচার পরিলক্ষিত হয় :

> রাজা এমন লোককেই অমাত্যরূপে নিযুক্ত করিবেন, যিনি সদ্বংশজাত, প্রজ্ঞাবান, শুদ্ধ, শূর ও স্বামীর প্রতি ভক্তিমান। কারণ, গুণের প্রাধান্যই সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১৮]।

মুদ্রারাক্ষস নাটকে ঘটনাবলীর স্রোতধারায় চাণক্য এবং রাক্ষস উভয়েরই নিযুক্ত করা অনেক গুপ্তচরের পরিচয় মেলে। দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরের শত্রুতা সম্বন্ধে দেশের শাসক অবশ্যই সজাগ থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মে দক্ষ গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজ্যের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা *অর্থশাস্ত্র*সম্মত ব্যাপার। *অর্থশাস্ত্রা*নুসারে গূঢ়পুরুষ অর্থাৎ ছদ্মবেশধারী গুপ্তচর নানা রকমের হতে পারে। যেমন :

১। কাপটিক (কপটবৃত্তি ছাত্র),
২। উদাস্থিত (উদাসীন সন্ন্যাসী),

৩। গৃহপাতক (কর্তৃভূত গৃহস্থ),
৪। বৈদেহিক (বণিক),
৫। তাপসের বেশধারী,
৬। সত্রী (নানা শাস্ত্র অধ্যয়নকারী বলে পরিচিত),
৭। তীক্ষ্ণ (শরীর নিরপেক্ষ অতি সাহসী ব্যক্তি),
৮। রসদ (বিষপ্রদায়ী ব্যক্তি),
৯। ভিক্ষুকী (পরিব্রাজিকা)।

এ ছাড়া কার্তান্তিক (দৈবজ্ঞ), নৈমিত্তিক (শুভাশুভ শকুনজ্ঞতা) ও মৌহূর্তিকের (ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষিকের) বেশধারী গুপ্তচরদের কথাও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৩২]।

মুদ্রারাক্ষস নাটকে ক্ষপণক জীবসিদ্ধি *অর্থশাস্ত্রানু*সারে উদাস্থিত গুপ্তচর। আবার এই জীবসিদ্ধিই রাক্ষস দ্বারা শত্রুপক্ষ আক্রমণের উপযুক্ত সময় নির্দেশের মধ্য দিয়ে *অর্থশাস্ত্র*সম্মত মৌহূর্তিক গুপ্তচরের পরিচয় বহন করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে 'যমের পট' প্রদর্শনকারী সিদ্ধার্থক হলেন 'কার্তান্তিক' গুপ্তচর। *অর্থশাস্ত্রে* গুপ্তচরের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে "এই প্রণিহিত লোকেরা গ্রামবাসীদের (কিংবা গ্রাম মুখ্যদিগের) ও অধ্যক্ষদিগের শুচিতা ও অশুচিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে" [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১৩]। নাটকের প্রথম অঙ্কে যমের পটধারী গুপ্তচর নিপুণক *নাট্যশাস্ত্র* নির্দেশিত কার্তান্তিক গুপ্তচর বৃত্তি (যমের পট দেখিয়ে জীবিকা অর্জনকারী) করে কুসুমপুরের ব্যক্তিদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী তাদের তথ্য চাণক্যের নিকট বর্ণনা করেছেন। এই নিপুণকই চাণক্যের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্থ হয়ে একটি প্রাকৃত গাঁথা লিখে পাঠান; তাতে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষের পূর্ণতার পরিচয় রয়েছে। চন্দ্রের এই পূর্ণতার বর্ণনায় *অর্থশাস্ত্র* প্রতিপাদিত অষ্টাদশ মণ্ডলের সূচনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ মণ্ডল সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে :

> বিজিগীষু ও ইহার মিত্র এবং মিত্রমিত্র এই তিনটিকেও প্রকৃতি ধরা হয়। ইহাদের প্রত্যেকে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া অষ্টাদশ অবয়ব যুক্ত মণ্ডল গঠিত করেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৮৩]।

আবার এই নিপুণকই নন্দ-অমাত্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয় চাণক্যের নিকট উপস্থাপন করেন। গুপ্তচরের এ ধরনের আচরণও *অর্থশাস্ত্র* অনুমোদিত। সেখানে বলা হয়েছে :

(শত্রু) বন্ধু ও রত্নের অপহরণ, গূঢ় পুরুষদিগের সংবাদ সংগ্রহের পরিচয়, (শত্রুর ছিদ্র পাইলে) পরাক্রমের ব্যবস্থা সমাধি বা সন্ধি, বিশ্বাসার্থ রাজ-কুমারাদিরূপ আহিতবস্তুর মোচন ও মারণাদি যোগের আশ্রয় গ্রহণ [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৪৪-৬৫]।

রাক্ষসের অঙ্গুরীয়টি চাণক্য নিজ কার্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তা সুচতুর ব্যবহারের মাধ্যমে রাক্ষসকে আত্মসমর্পণ করিয়ে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। রাক্ষসের নিকট বন্ধু শকটদাসকে দিয়ে নাম পরিচয়হীন এক চিঠি লিখিয়ে চাণক্য উল্লিখিত রাক্ষসের অঙ্গুরীয় দিয়ে সীলমোহর করান। শকটদাসের দ্বারা লিখিত পত্রটি পড়ে চাণক্য বলেন, "বা! চমৎকার লেখা"।

কি রকম ব্যক্তি পত্র লেখার যোগ্য সে সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ দ্রষ্টব্য

এমন ব্যক্তি লেখক হবেন, যিনি সকল প্রকার আচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, যিনি শীঘ্র বাক্য রচনায় নিপুণ, যিনি সুন্দর হস্তাক্ষর দ্বারা লিপি লিখতে জানেন এবং যিনি (সুস্পষ্টভাবে) লেখ পঠনেও সমর্থ [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১০২]।

এ প্রসঙ্গে শুক্রনীতির কথাও স্মরণ করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, "কায়স্থো লেখকস্তথা" [জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৯০ :২০২]। অর্থাৎ লেখক হবেন একজন কায়স্থ শ্রেণীর ব্যক্তি। আলোচ্য পত্রটির লেখক শকটদাসও একজন কায়স্থ লোক।

এই পত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত জানা যায় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। পত্রের শেষভাগে লেখা হয়েছে, "পত্রবাহক আমার অতি আপন জন, বাকী যা শোনার তার মুখ থেকে শুনবেন।" এই পত্রটির রচনা পদ্ধতির মধ্যে *অর্থশাস্ত্রের* প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; সেখানে বলা হয়েছে কোন লেখকের (পত্রের) পরিসমাপ্তি সূচনার জন্য 'ইতি' শব্দ (অর্থাৎ যদি লেখে আর কিছু বলিবার না থাকিলে) থাকিবে, অথবা (অর্থাৎ আরও গোপনীয় বিষয় বলিবার থাকিলে) ইহার (অর্থাৎ লেখ হরের) মুখ হইতে অবশিষ্টাংশ শ্রোতব্য'-এইরূপ উক্তি থাকিবে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১০০]।

নাটকের প্রথম অঙ্কে চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী চন্দন দাসকে চাণক্যের নিকট হাজির করা হয়। চাণক্য তাকে সাদর সম্ভাষণ করায় চন্দনদাসের মনে শঙ্কা দেখা দেয়। তিনি নিজে নিজে বলেন, "*অত্যাদরঃ শঙ্কনীয়ঃ*"। এখানে নাট্যকারকে কৌটিল্য সূত্র দ্বারা প্রভাবিত দেখা যায়। কৌটিল্য সূত্রে বলা হয়েছে, "অত্যুপচারঃ শঙ্কিতব্যঃ" [R. Sharma Sastri ১৯১৯ : ৪৪৭]। রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রাদির সন্ধান দিতে অনিচ্ছুক চন্দনদাসকে তার স্ত্রী-পুত্র-ধন-সম্পদসহ আটক করার নির্দেশ দেন চাণক্য। নাটকের শেষ দৃশ্যেও দেখা যায় চন্দনদাস তাঁর বন্ধু রাক্ষসের প্রতি গভীর বন্ধুত্বেরই

পরিচয় বহন করছে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও চন্দন দাস তার বন্ধু রাক্ষসের পরিবার-পরিজনের সন্ধান চাণক্যের নিকট ব্যক্ত করেন নি। এই ঘটনাসমূহের মধ্যে রাক্ষসের সাথে চন্দন দাসের সুগভীর বন্ধুত্বের পরিচয় মেলে যা *অর্থশাস্ত্রের* ভাষায় "অদ্বৈধ্য মিত্র" নামে আখ্যায়িত :

> যে মিত্র (মিত্রের সহিত) সমান সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, যিনি সদাই তাঁহার উপকার করেন এবং যিনি বিকারগ্রস্ত হন না এবং বিপদে দ্বৈধীভাবাপন্ন হন না, সেই মিত্রকে 'অদ্বৈধ্য মিত্র' বলা হয় এবং (মিত্রতার নিত্য সম্বন্ধ থাকে বলিয়া) তিনি মিত্রভাবীমিত্র বলিয়াও আখ্যাত হয়েন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১২৬]।

নাটকে প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে চাণক্যশিষ্যের উক্তি থেকে জানা যায় সিদ্ধার্থক বধ্যভূমি থেকে শকটদাসকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। চাণক্যের গোপন নির্দেশমতই সে সিদ্ধার্থক সুষ্ঠুভাবে কাজটি করেছেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে চাণক্য মনে মনে বলছেন, "সাধু সিদ্ধার্থক! সাধু! কার্যকারিতা আরম্ভ হয়েছে।"

সিদ্ধার্থককে দিয়ে চাণক্য পরিকল্পিত রাক্ষসজয়ের গুপ্ত কার্যাবলীর শুভ সূচনার সঙ্গে ভাগুরায়ণ, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেনাদি চাণক্যকে ছেড়ে চলে গেছেন-এই ঘটনার মধ্যে চাণক্যের কূটনৈতিক বুদ্ধির সফল প্রয়োগ উন্মোচিত। এরা যে চাণক্যপক্ষ পরিত্যাগ করে রাক্ষসপক্ষ অবলম্বন করেন এর মধ্যেও *অর্থশাস্ত্রের* নিম্নোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> বিজিগীষু (রাজা) নিজের বিশ্বস্ত শ্রেণীমুখ্যকে (দ্বেষের হেতু দেখাইয়া) নিজ রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। সেই (বিশ্বস্ত শ্রেণীমুখ্য) শত্রু রাজাকে আশ্রয় করিয়া শত্রুপক্ষের কার্যস্থলে নিজ দেশ হইতে সাহায্য করিবার জন্য সহায়ক সংগ্রহ করিবেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২৯৪]।

মুদ্রারাক্ষসের দ্বিতীয় অঙ্কে শুরুতেই বিরাধ গুপ্ত নামক রাক্ষসচরের প্রবেশ। কুসুমপুরস্থিত চাণক্যের কার্যাবলী জেনে তা রাক্ষসকে অবহিত করানোর জন্য তিনি এসেছেন। শত্রুপক্ষের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ বিষয়টিও অর্থশাস্ত্রসম্মত ব্যাপার :

> শত্রুদিগের রাজ্যেও তাহাদের নিকট হইতে গূঢ় পুরুষদিগের বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া সেখানেই তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা

সেখান হইতে অনায়াসে গুপ্তসমাচার বাহির করিয়া পাঠাইতে পারিবে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২৯]।

বিরাধগুপ্ত রাক্ষসনিযুক্ত অনেক গুপ্তচরের মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। চন্দ্রগুপ্তকে বধ করার উদ্দেশ্যে রাক্ষস যে বিষকন্যাকে প্রয়োগ করেছিলেন শত্রুনাশের জন্য প্রতিপক্ষের এরূপ উদ্যোগ *অর্থশাস্ত্র* নির্দেশিত ষড়যন্ত্রমূলক কাজেরই পরিচয় বহন করে। এরূপ আচরণকে *অর্থশাস্ত্রে* "তুষ্ণীযুদ্ধ" বলা হয়েছে।

তুষ্ণীযুদ্ধের আরো পরিবেশ লক্ষ করা যায় অভয়দত্ত কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তকে বিষমিশ্রিত ঔষধ দানের ষড়যন্ত্রের মধ্যে। তুষ্ণীযুদ্ধ হলো :

> An attempt to win over the chief officers of the enemy by intrigue, is the characteristic of silent battle. [R. Sharma Shastri ১৯১৫ : ৩৪৮]।

চন্দ্রগুপ্তকে প্রদত্ত ঔষধের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় চাণক্য বৈদ্য অভয়দত্তকেই সেই ঔষধ পাণ করান; এতে অভয়দত্তের মৃত্যু হয়। চাণক্যের এহেন আচরণের মধ্যেও *কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রের* প্রভাব লক্ষ্য করা যায় :

> ঔষধানি চ সর্বাণি পানং পানীয়মেব'চ।
> তৎকল্পকৈঃ সমাস্বাদ্য প্রাশ্নীয়াদ্ভোজনানি'চ
> [Rajendalal Mitra ১৮৬১ : ৩৯]

রাক্ষসের গুপ্তচর দারুবর্মা চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রচালিত তোরণ নির্মাণ করেছিলেন সেটিও অর্থশাস্ত্রসম্মত নির্মাণকার্য। রাজভবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

> বাসগৃহ শত্রুর আক্রমণের প্রতিকারের জন্য এমনভাবে নির্মিত হইবে যে, (বিপদ উপস্থিত হইলে) ইহাকে তল পর্যন্ত পাতিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা যন্ত্রবদ্ধ থাকিবে। [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৫৫-৫৬]।

পর্বতেশ্বরের শ্রাদ্ধের সময় তাঁর ব্যবহৃত তিনখানি অলংকার চাণক্যের নির্ধারিত ব্যক্তি বিশ্বাবসু প্রমুখ তিন ভাইকে দেওয়া হয় এবং তারা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাক্ষসের নিকট ঐ অলংকারগুলো বিক্রয় করেন। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার এক কৌশল হিসেবে রত্নালংকার প্রভৃতি বিক্রয় করার ব্যবস্থা *অর্থশাস্ত্র* সমর্থিত :

> শত্রুর অর্থাৎ সামবায়িকগণের অন্যতমের সম্বন্ধীয় কোন পণ্য (রত্নাদি), অন্যের অজ্ঞাতসারে বিজিগীষুর হস্তগত করা হইবে। তাহার বৈদেহক ব্যঞ্জন গূঢ় পুরুষেরা সেই পণ্যটি শত্রু ধর্মা অন্য সামবায়িকমুখ্যের নিকট নিয়া বিক্রয় করিবে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২২৫]।

চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুরঙ্গ পথে গুপ্তঘাতকদের স্থাপন করেন। রাক্ষসের এই উদ্যোগের পেছনেও অর্থশাস্ত্রের বিধান রয়েছে : রাত্রিতে সুরঙ্গপথে শত্রু রাজার আবাসে প্রবেশ লাভ করিয়া সুপ্ত অমিত্রকে বধ করিবেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২৮৪]।

তৃতীয় অঙ্কে রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর মন্ত্রী চাণক্যের মধ্যে এক মিথ্যা ঝগড়ার অবতারণা করা হয়েছে। নাটকীয় ভাষায় একে বলা হয়েছে 'কৃতক-কলহ'। শত্রুপক্ষের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটানোর উদ্দেশ্যে চাণক্যের কূটবুদ্ধিপ্রসূত এই 'কৃতককলহ'। রাজা চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী মহোৎসব নিষিদ্ধ করার কারণ জানতে চাইলে চাণক্য তা বলতে অস্বীকৃতি জানান এবং উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে কলহ জমে উঠে। এমন সময় চন্দ্রগুপ্তের রাজ-অহমিকাকে উদ্দীপ্ত করার অভিপ্রায়ে যে দুইজন বৈতালিক রাজার স্তুতি বন্দনা করেন তাঁদের প্রতি তুষ্ট হয়ে চন্দ্রগুপ্ত শত সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে চাণক্য বাধা দেন এবং বলেন :

> হ্যাঁ, বুঝেছি, এটা রাক্ষসের চাল। দুরাত্মা রাক্ষস, ধরা পড়লে যে, কৌটিল্য জেগেই আছে [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ২৫৮]।

চাণক্যের এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির এক বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। দেশের শাসক আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় শত্রু সম্বন্ধে অবশ্যই সজাগ থাকবেন। আর এ জন্য বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের সাহায্যে শত্রুপক্ষের কার্যকলাপ জানবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বৈতালিকদ্বয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিশাসিত রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীকে প্রাধান্য না দিয়ে রাজাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে প্ররোচনা যুগিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষের কাজ। এরূপ পরিস্থিতিতে চাণক্য যা বলেছেন অর্থাৎ বৈতালিকগণ রাক্ষসের চর এই উপলব্ধির মধ্যে *অর্থশাস্ত্রের* জ্ঞান প্রতিভাত। এ সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে : শত্রুর দ্বারা প্রেরিত উভয় বেতন চরদিগকেও উত্তমরূপে জানিয়া রাখিবেন এবং তাহাদের শুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় তৎপ্রকার চর দ্বারাই জানিবেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২৯]।

এই তৃতীয় অঙ্কেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে রাজ্যশাসন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে চাণক্য বলেন যে- সিদ্ধি তিনি প্রকার — রাজায়ত্ত সিদ্ধি, সচিবায়ত্ত সিদ্ধি এবং উভয়ায়ত্ত সিদ্ধি।

চাণক্যোক্ত তিনরকম সিদ্ধির পরিচয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটু ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায় :

যে সিদ্ধি মন্ত্রশক্তি (মন্ত্রণা-শক্তি) দ্বারা সাধ্য, ইহার নাম মন্ত্রসিদ্ধি; যে সিদ্ধি প্রভুশক্তি দ্বারা সাধ্য, ইহার নাম প্রভু সিদ্ধি; এবং যে সিদ্ধি উৎসাহ শক্তি দ্বারা সাধ্য, ইহার নাম উৎসাহ সিদ্ধি [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৮৪]।

চন্দ্রগুপ্তের প্রশ্নের জবাবে চাণক্য রাক্ষসকে বলপূর্বক আবদ্ধ না করার কারণ হিসেবে বলেন :

যেসব প্রজারা নন্দের অনুরক্ত এবং চরিত্রের মর্যাদা জানে, তারা তাদের প্রভুর প্রতি রাক্ষসের অবিচল ভক্তি দেখে এবং সুদীর্ঘকাল একত্রে বাস করার ফলে রাক্ষসকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। রাক্ষস নিজেও প্রজ্ঞা ও পৌরুষবান, সহায় সম্পদ তাঁর প্রচুর, অর্থও রয়েছে পর্যাপ্ত। সে যদি এখানে এই নগরের মধ্যেও থেকে যেত, তবে নিশ্চিত নাগরিকদের মধ্যে বড়রকমের বিক্ষোভের সঞ্চার ঘটাতো। দূরে সরিয়ে দেওয়ায় এটাই হয়েছে যে বাইরে বাইরে যে যতই ঝঞ্ঝাট বাধাক, কোনো না কোনো উপায়ে তাঁকে বশে আনতে পারব। অতএব সে যখন এখানে ছিল, সে ছিল হৃদয়ের শেল, দূরে ঠেলে দিয়ে সে শেল উপড়ে ফেলেছি [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৩০]।

চাণক্যের এই উক্তির মধ্যে *অর্থশাস্ত্র* ব্যাখ্যাত রাজার প্রতি অভ্যন্তর কোপ ও বাহ্যকোপের বিষয়টি স্মরণীয় :

বাহ্যকোপের চেয়ে আভ্যন্তর কোপ অধিকতর ভয়াবহ" [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১৭৭]।

এই নীতির আলোকে চাণক্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধার সৃষ্টি করেন নি।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তার মন্ত্রী চাণক্য এক কলহে লিপ্ত হয়েছেন। রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে কলহ শোভনীয় নয়। কঞ্চুকী এরূপ অনভিপ্রেত

ঘটনার জন্য মন্ত্রী চাণক্যকেই দায়ী করেছেন। কারণ রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রী রাজকার্য পরিচালনা করেন এবং রাজাকে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রীতিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে যে কলহ সৃষ্টি হয় তাতে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অবনতি লক্ষ করা যায়। কৌমুদী মহোৎসব বন্ধের ব্যাপার নিয়ে রাজা চন্দ্রগুপ্তকে মন্ত্রী চাণক্য নিশ্চয়ই সুপরামর্শ দেননি। তাই উভয়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এটি ছিল 'কৃতককলহ' তথাপি কঞ্চুকীসহ সাধারণ মানুষের নিকট এটি কলহ হিসেবেই বিবেচিত। আর এ জন্যই কঞ্চুকী কলহের জন্য চাণক্যকে দায়ী করেছেন। কেননা সুযোগ্য মন্ত্রীর সুচিন্তিত পরামর্শে রাজা মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে *অর্থশাস্ত্রের* বিধি স্মরণীয় :

> ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) দ্বারা সংবর্দ্ধিত, মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা দ্বারা সংস্কৃত ও শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুষ্ঠান পর হইলে ক্ষাত্রধর্ম বা ক্ষত্রিয়কুল শাস্ত্র সাহায্য ব্যতিরেকেও একান্তভাবে অজেয় (অলভ্য) বস্তুও জয় করিয়া লইতে পারে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২০]।

তৃতীয় অঙ্কের শেষ শ্লোকে কৃতককলহ-উত্তর-মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বলেন, "আর্যের আজ্ঞাতেই আমি তাঁর গৌরব লঙ্ঘন করেছি, তাতেই আমার ইচ্ছে হচ্ছে ভূমিগর্ভে আত্মগোপন করি [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ ঃ ৩৩২]।

চন্দ্রগুপ্তের এই অনুশোচনামূলক অভিব্যক্তির পশ্চাতে চাণক্যসূত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। চাণক্যসূত্রে বলা হয়েছে :

> মতিমৎসু মূর্খমিত্রগুরুবল্লভেষু বিবাদেন কর্তব্যঃ [R. Sharma Sastri ১৯১৯ : ৪৪৭]।
> অর্থাৎ মূর্খ, বন্ধু, গুরুজন ও প্রিয়জনের সহিত বিবাদ করা উচিত নয়।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় ভদ্রভট প্রমুখ ব্যক্তিগণ চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করে মলয়কেতুকে আশ্রয় করেছে। তবে তারা রাক্ষসের মাধ্যমে না এসে কুমারের সেনাপতি শিখরসেনের মাধ্যমে এসেছেন। এ ব্যাপারটির রহস্য ভাগুরায়ণকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। তখন ভাগুরায়ণ বলেন: "রাক্ষসকে মলয়কেতুর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং পরম শুভার্থী" মনে করার কারণ নেই। কেননা, অমাত্য রাক্ষসের শত্রুতা চাণক্যের সঙ্গে, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নয়। তাই যদি অতি গর্বোদ্ধত চাণক্যকে সহ্য করতে না পেরে চন্দ্রগুপ্ত কখনও তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেন, তখন অমাত্য

রাক্ষস বন্ধুজনের স্বার্থে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিলিত হতে পারেন, কারণ রাক্ষসের রয়েছে নন্দবংশের প্রতি ভক্তি, আর চন্দ্রগুপ্ত নন্দের বংশধর তো বটে। 'পিতার সময় থেকে ইনি মন্ত্রিত্ব করে আসছেন' এই ভেবে চন্দ্রগুপ্তও তার সঙ্গে সন্ধিতে রাজি হবেন। এমনটা ঘটলে কুমার আর আমাদের উপর বিশ্বাস রাখবেন না- এটাই এদের কথার মানে" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৩৫-৩৬]।

ভাগুরায়ণের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে *অর্থশাস্ত্রের* নিম্নলিখিত উক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিবেচ্য :

> যে রাজার, অপর যে রাজার নিকট হইতে ভয়, বৈর ও দ্বেষের সম্ভাবনা আছে (গূঢ়পুরুষগণ) সে রাজাকে সেই অপর রাজা হইতে ভিন্ন করিবে এবং বলিবে- 'এই রাজা তোমার শত্রুর সহিত সন্ধি করিতেছেন, শীঘ্রই তিনি তোমাকেও প্রবঞ্চিত করিবেন, সুতরাং তুমি অতিশীঘ্র (সেই বিজিগীষুর সহিত) সন্ধি করিয়া ফেল এবং সেই অপর রাজার নিগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল হও [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ :২২৮]।

গুপ্তচরগণ রাজসমীপে অবস্থান করে তাদেরকে কেমনভাবে প্রভাবিত করেন এ বিষয়ে *অর্থশাস্ত্রের* দ্বাদশ ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

> (বিশ্বস্তভাবে) রাজসমীপে অবস্থানকারী 'সত্রী' রাজাকে এইরূপ বুঝাইবে 'অমুক অমুক, মহামাত্র আপনার শত্রু পুরুষদিগের সহিত কথাবার্তা চালায়। সত্রীর এই বচন রাজা অঙ্গীকার করিয়া লইলে পর, সেই সত্রী রাজার দূষ্যপুরুষদিগকে তাহারা (মহামাত্রের) শাসন বা সন্দেশ লইয়া শত্রুর সমীপে যাইতেছে বলিয়া প্রদর্শন করিবে এবং বলিবে, দেখুন, যাহা বলিয়াছি তাহই ঘটিতেছে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ২৭৫-৭৬]।

পঞ্চম অঙ্কে মলয়কেতুর শিবির থেকে বিনা ছাড়পত্রে কুসুমপুরে যাওয়ার উদ্যোগী চাণক্যের চর রাক্ষসের বন্ধু সিদ্ধার্থক পরিচয়বিহীন একটি পত্র ও একটি অলংকার পোটিকাসহ ভাগুরায়ণের হাতে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটি মলয়কেতুও প্রত্যক্ষ করেন। শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে সিদ্ধার্থক পত্র ও অলংকারের গোপন তথ্য প্রকাশ করে বলেন, এগুলো রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের নিকট পাঠাচ্ছেন। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সৌহার্দ গড়ে তুলতে সচেষ্ট এবং মলয়কেতুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৪৮]।

এই নাটকীয় ঘটনার মধ্যে *অর্থশাস্ত্রোক্ত* পূর্বোল্লিখিত গুপ্তচরবৃত্তির সাফল্য প্রতিফলিত।

রাক্ষসের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে মলয়কেতু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলে ভাগুরায়ণ তাঁকে শান্ত করার জন্য অর্থশাস্ত্রকারদের নির্দেশ স্মরণ করতে বলেন, "কুমার, এ সংসারে অর্থশাস্ত্র নিয়ে যাদের কারবার তাদের কাছে শত্রু মিত্র বা উদাসীন এই শ্রেণীর বিচার প্রয়োজন নির্ভর।" আরও বলেন "দেখুন নীতির এমনি প্রভাব যে প্রয়োজনের অনুরোধে এ মিত্রকে শত্রুতে এবং শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে। পূর্ববৃত্তান্ত সব ভুলে গিয়ে মানুষ জীবদ্দশাতেই যেন জন্মান্তর লাভ করে। [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৪৬]।

ভাগুরায়ণের এই কথার মধ্যে *কামন্দকীয় নীতিসারের* নিম্নোদ্ধৃত নীতিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

> It is causes that create enemies and allies. therefore, always, should the *vijigisu* shun such causes that might create enemies [Manmatha Nath Dutt ১৮৯৬ : ৯৪-৯৫]।

বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য কূটনীতির প্রভাবে মলয়কেতু থেকে রাক্ষসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন; রাক্ষস সহায়হীন।

বন্ধু চন্দনদাসের জীবন সংশয়াপন্ন জেনে (ষষ্ঠ অঙ্কে) পুনরায় তিনি পাটলীপুত্রে প্রবেশ করেন এবং সর্বত্র চাণক্যনীতির সুফল দেখতে পেয়ে মর্মবেদনা বোধ করেন। ছদ্মবেশে যখন তিনি এক উদ্যানে ঘুরছিলেন তখন একজন লোককে রশি হাতে উদ্‌বন্ধনে জীবননাশে উদ্যোগী দেখতে পান। সেই মৃত্যুপথগামী ব্যক্তি বলেন :

> আর্য চাণক্যের নীতি যেন একগাছি দড়ি। ছয়গুণের সংযোগে সে নীতি যেমন দৃঢ় ছটা পাক দেওয়ায় এ দড়িও তেমনি শক্ত। শত্রুকে শায়েস্তা করতে সেই নীতির মত এই দড়িও সদা প্রস্তুত। একে একে উপায়ের প্রয়োগে নীতির প্রধান পদ্ধতি যেমন রচনা করা হয়েছে, চারটি কৌশল ক্রমে খাটিয়ে দড়ির মুখের ফাঁসিটিও তেমনি তৈরি করা হয়েছে। এ হেন চাণক্য নীতিরজ্জুর জয় হোক [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৫৭]।

এই উদ্ধৃতাংশে *অর্থশাস্ত্রোক্ত* সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও দ্বৈধীভাবরূপ ছয়গুণ [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৮৬] এবং *কামন্দকীয় নীতিসারে* বর্ণিত সাম,

দান, দণ্ড ও ভেদরূপ চার উপায়ের সংকেত লক্ষ্য করা যায়। নীতিসারে আরো তিন প্রকার সহ মোট সাত প্রকার উপায়ের কথা উল্লেখ আছে :

সাম দানঞ্চ দণ্ডশ্চ ভেদশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
মায়োপেক্ষেন্দ্রজালং চ সপ্তোপায়াঃ প্রকীর্তিতাঃ
[Rajendralal Mitra ১৮৬১ : ১১]

সপ্তম অঙ্কে চাণক্যকে দেখে রাক্ষস মনে মনে তাঁর প্রশংসা করে বলেন- "এই সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা কৌটিল্য! সাগর যেমন রত্নরাশির আকর, ইনি তেমনি সর্বশাস্ত্রের আকর। বিদ্বেষ বশে এর এতোগুণেও কিন্তু আমরা তুষ্ট নই [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৬৬]।

এই উক্তির মাধ্যমে অশেষ গুণের আকর চাণক্যের প্রতি *অর্থশাস্ত্রের* নিম্নোক্ত বচন প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (অপর) সব বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সব কর্মের উপায় বা সাধন স্বরূপ, এবং সর্বপ্রকার (বৈদিক ও লৌকিক) ধর্মের আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া সর্বদাই বিবেচিত হয় [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৮]।

চণ্ডালবেশধারী দু'ব্যক্তি রাক্ষসকে চাণক্যের নিকট হাজির করলে, "এই যে অমাত্য রাক্ষস, আমি বিষ্ণুগুপ্ত, আপনাকে অভিবাদন করছি"-এই বলে চাণক্য রাক্ষসকে স্পর্শ করতে গেলে রাক্ষস বলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, চণ্ডালের স্পর্শে অপবিত্র আমাকে স্পর্শ করা তোমার উচিত নয়" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৬৬]।

হিন্দু সমাজে বর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্পর্শে যে অপিবত্র হয়ে যেতেন রাক্ষসের এই উক্তির মধ্য দিয়ে তা পরিস্কার হয়ে ওঠেছে। তবে রাক্ষসের এরূপ অনুভূতি অশাস্ত্রীয় নয়; কৌটিলীয়-*অর্থশাস্ত্রে* চণ্ডাল-ব্রাহ্মণের অসহযোগিতার কথা বলা হয়েছে- "চণ্ডালদিগের কূপ যেমন চণ্ডালদিগেরই উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে, অন্য লোকের জন্য নহে, তেমন এই নীচ রাজা নীচ জনগণেরই উপযোগের বা সুখ সাধনের যোগ্য, আপনাদের ন্যায় আমাদিগের সুখ-সাধনের নহে" [রাধাগোবিন্দ বসাক- ৩৬]।

এই উদ্ধৃতির মধ্যে সমাজে অস্পৃশ্যতার কথা জানা যায় এবং এ থেকে মনে হয় *মুদ্রারাক্ষসের* যুগে সমাজজীবনে বর্ণবিভাগ ও অস্পৃশ্যতার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণগণ সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকদেরকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন তা এই

নাটকের অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। মুরা নাম্নী শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী চন্দ্রগুপ্ত রাজা হলেও ব্রাহ্মণাভিমানী চাণক্য তাঁকে অবজ্ঞাসূচক 'বৃষল' বলে সম্বোধন করেছেন। আবার অপর ব্রাহ্মণ অমাত্য রাক্ষসকেও অব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে দেখা যায়। জন্মসূত্রে হীন চন্দ্রগুপ্তের প্রতি নন্দরাজলক্ষ্মীর অনুরক্তির বিষয়টি ব্রাহ্মণ অমাত্য রাক্ষস ভালভাবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা রাজলক্ষ্মীকে তিনি এ জন্য তিরস্কার করে বলেছেন, "পৃথিবীতে যত বিখ্যাত বংশের কুলীন নৃপতি ছিলেন, তাঁদের সকলেই কী ভস্মীভূত হয়েছিলেন যে, হে দুঃশীলা, কুলহীন মৌর্যকে তুমি পতিত্বে বরণ করলে?" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩০৮]।

নাটকীয় এই সংলাপগুলোর মধ্য দিয়ে কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত রাজার ষোলটি (১৬) আভিগামিক গুণের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানে বলা হয়েছে :

> রাজা হইবেন মহাকুলীন, দৈবসম্পন্ন, বুদ্ধিসম্পন্ন, সত্ত্বসম্পন্ন, বৃদ্ধদর্শী, ধার্মিক, সত্যবাক, অবিসংবাদক (সত্যপ্রতিজ্ঞ), কৃতজ্ঞ, স্থূললক্ষ, মহোৎসাহ, অদীর্ঘসূত্র, শক্যসামন্ত, দৃঢ়বুদ্ধি, অক্ষুদ্র পরিষৎক ও বিনয়কাম" [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৭৭]।

নাটকের শেষভাগে রাক্ষস চাণক্যের নিকট আত্মসমর্পণ করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হলে আনন্দিত বিজয়ী চাণক্য অধীনস্থ পুরুষদের বলেন, "এখন হস্তি-অশ্ব ব্যতিরেকে সকলের বন্ধন মোচন কর। প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ, তাই আমি এখন কেবল শিখা বন্ধন করি" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৬৯]।

শত্রুজয়ের পর বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য চাণক্যের এই ঘোষণাটি যথার্থই *অর্থশাস্ত্র* সমর্থিত। অর্থশাস্ত্রকার বলেন, "কোন নূতন দেশ জয় করিয়া লাভ করিলে কিংবা যুবরাজের অভিষেক হইলে, পুত্রজন্ম হইলে (রাজা) কারাবন্ধন হইতে কয়েদীদিগের মোক্ষ বিধান করিতে পারেন [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১২৮]।

রাক্ষস মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে চন্দ্রগুপ্ত নিজ সৌভাগ্য ও আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "এর পরও কি প্রিয় আছে? নন্দরা সকলে উন্মূলিত হয়েছে, আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, রাক্ষসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। এর চাইতে প্রিয় কোন্ কাজ আর করণীয় আছে?" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৬৯]।

চন্দ্রগুপ্তের এই উক্তির মধ্যে রাজ্যের স্থিতি ও সমৃদ্ধি দুইয়েরই সম্ভাবনা হয়েছে দ্যোতিত। এরূপ অবস্থায় *অর্থশাস্ত্র* কার কৌটিল্য বলেছেন,

শাস্ত্রজ্ঞ, কুল ও স্বভাবে উন্নত পুরোহিত দ্বারা সংবর্ধিত, দৃঢ়ভক্তি, শক্তিমান, প্রভাবযুক্ত মন্ত্রীদের পরামর্শ দ্বারা রাজা যদি সংস্কৃত হন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে সেই রাজা সহজেই শত্রুকে জয় করিতে পারেন" [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১৯-২০]।

এই নাটকের সমাপ্তি শ্লোকে অর্থাৎ ভরত বাক্যে দেখা যায়, যে স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে এক প্রলয়কালে জলে নিমজ্জমান পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন তিনিই বর্তমানে পৃথিবীকে ম্লেচ্ছদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য চন্দ্রগুপ্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাজা চন্দ্রগুপ্তরূপে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব অভিব্যক্তির মধ্যে *অর্থশাস্ত্র* বিধৃত রাজার দৈব উৎস স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে *মহাভারত*, *ভাগবত* প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত পৃথু রাজার উৎপত্তি ও ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রাজ্য শাসনরূপ কার্যভার গ্রহণের কাহিনীটির সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় [কালিপ্রসন্ত সিংহ ১৯১৩ : ৪১৪]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *মুদ্রারাক্ষস* নাটকের নাট্যকার *অর্থশাস্ত্র*সম্মত কিছু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে *অর্থশাস্ত্রের* সঙ্গে নাটকটির সম্বন্ধ দৃঢ় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রস্তাবনায় সূত্রধার তাঁর স্ত্রীকে 'উপায় নিলয়ে' বলে সম্বোধন করেছেন। এই 'উপায়' শব্দটি নাটকের অন্যত্রও দেখা যায় [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৮১, ৩৯৬]। আর এটি যে *অর্থশাস্ত্রে* একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রে* সাম-দান-দণ্ড-ভেদ এই চার উপায়ের কথা বলা হয়েছে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২:২০৯]। আবার *কামন্দকীয় নীতিসারে* সাম-দান-দণ্ড-ভেদ-মায়া-উপেক্ষা-ইন্দ্রজাল এই সাতটিকে উপায় বলে অভিহিত করা হয়েছে [Rajendralal Mitra ১৮৬১ : ১১১]।

'শত্রু', 'মিত্র', 'উদাসীন' *অর্থশাস্ত্রোক্ত* [রাধাগোবিন্দ বসাক- : ২৯]। এই শব্দগুলো বিশাখদত্ত সার্থকভাবে তাঁর নাটকে প্রয়োগ করেছেন [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮০ : ৪৩১]। 'প্রকৃতি' তথা 'প্রকৃতিক্ষোভ' শব্দ দু'টিরও প্রয়োগ নাটকে দৃষ্ট হয় [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৩৫ : ৩৮৫ ও ৪৩২]। এগুলো *অর্থশাস্ত্রে* বহু ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ১০১]।

এছাড়া বিশাখদত্ত চাণক্যের বন্ধু ইন্দুশর্মা যে উশনা বা শুক্রাচার্যের দণ্ডনীতিতে সুবিজ্ঞ ছিলেন, একথা উল্লেখ করেছেন [গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৩৮৫]। এই উশনস্ বা উশনা নামটি কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রে* অনেকবারই উদ্ধৃত হয়েছে [রাধাগোবিন্দ বসাক- : ২৫২, ২৭৭, ২৯৮]। *অর্থশাস্ত্রে* 'ষাড়গুণ্য' নামে একটি অধ্যায় রয়েছে [রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩৭২ : ৪৩]। আর এই 'ষাড়গুণ্য' শব্দটির প্রয়োগ *মুদ্রারাক্ষস* নাটকেও দেখা যায় :

জগতঃ কিংন বিজিতং ময়েতি প্রবিচিন্ত্যতাম্।
গুরৌ ষাড়্গুণ্যচিন্তায়ামার্যে চার্যে চ জাগ্রতি।৭/১৩
[গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৫ : ৪৫৫]

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্রমধারায় কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্রের* উৎপত্তি ঘটে। বিশাখদত্ত *অর্থশাস্ত্রে* বর্ণিত রীতিনীতি অনুসরণ করে *মুদ্রারাক্ষস* নাটকটি রচনা করেছেন। নান্দী থেকে শুরু করে ভরত বাক্য পর্যন্ত অর্থাৎ নাটকটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে নাটকীয় ঘটনাবলীর বিন্যাস রয়েছে তার মধ্যে *অর্থশাস্ত্র* নির্দেশিত রাজনীতি বিষয়ক বিধি-বিধানের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে *অর্থশাস্ত্রে* ব্যবহৃত কিছু পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করে নাট্যকার নাটকটির প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। ফলে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে *মুদ্রারাক্ষস* একখানি পরিপূর্ণ রাজনীতিমূলক নাটক হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্) ১৯৩০ — *রামায়নম্*. আযোধ্যা কাণ্ড। কলকাতা।

কালিপ্রসন্ন সিংহ (অনু) ১৯১৩ — *মহাভারত*. তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অনান্য (সম্) ১৯৮৫ — *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*. পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্) ১৮৯০ — *শুক্রনীতিসার*। কলকাতা।

পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্) ১৩১৯ — *শ্রীমদ্ভাগবত*। কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭২ — *সঞ্চয়িতা*। কলকাতা।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার — *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ।
১৯৮১ — কলকাতা।

রাধাগোবিন্দ বসাক — *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড।
১৩৭২ — কলকাতা।

Manmath Nath Dutt — *Kamandakiya Nitisastra.*
১৮৯৬ — কলকাতা।

P. V. Kane — *History of Dharmasastra.* পুনা।
১৯৪৬

Rajendralal Mitra — *The Nitisara*। কলকাতা।
১৮৬১

R. Sharma Sastri — *Kautilya's Arthasastra.*
১৯১৫ — বাঙ্গালোর।
১৯১৯ — *Arthasastra of Kautilya.* মহিশুর।

U. N. Ghoshal — *A History of Indian Political Ideas.*
১৯৬৬ — মাদ্রাজ।